বাংলাদেশ উপকূল অঞ্চলে বনায়ন

মীর মোহাম্মদ হাসান

শতাব্দীর অবহেলা, নিরক্ষরতা, যাতায়াতের অব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবর্তে উপকূল অঞ্চলের অর্থনীতি বর্তমানে ধ্বংসোন্মুখ। দুর্যোগের পৌনঃপুনিকতা এবং ধ্বংসলীলার ব্যাপকতায় বিশ্ববিবেক আলোড়িত হওয়ায় সরকারী প্রচেষ্টায় বিগত ষাট দশকে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়। দুর্যোগের কবল হইতে ফসল রক্ষা এবং কর্মসংস্থানই এই বাঁধ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

ষাট দশকের শেষ ভাগে সরকারী মালিকানাধীন জমি এবং বাঁধের বাহিরের পরিত্যক্ত চিলতে জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে বনায়নের কাজ আরম্ভ হয়। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প প্রাধান্য লাভ করে এবং এর বিপুল অর্থনৈতিক দিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হইলে ১৯৮১—৮২ সালের মধ্যে সৃষ্ট বনভূমির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,১২,০০০ একর। ফলে আগামী ২।৩ দশকের মধ্যে উক্ত এলাকার বনজ সম্পদ আহরণের কাজে প্রায় এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

The people of the coastal belt and offshore islands are very poor. Because of century old neglect the rural economy is handicapped by illiteracy, bad communication and hazard of natural calamities. The Coastal Embankment Project was launched in 1960 to reduce the damages of crops caused by cyclone and to increase the job opportunity for the people living in the area.

Experimentl plantations were raised in the coastal area on khash land and on the strips outside the poulders. Attention of the planners was drawn to the Coastal Afforestation Scheme after 1972, and the scheme got priority in the First Five Year Plan. When implemented 3 Coastal Afforestation Scheme would raise 112000 acres of plantation by 1781-82. The newly raised forest would create job opportunity for about one 100000 people in 2-3 decades' time.

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল অসংখ্য বদ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। গঠন প্রকৃতির দিক হইতে এই সমস্ত বদ্বীপ পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার বৃহৎ বদ্বীপ অঞ্চল হইতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার বাহিরে বৃহত্তর পর্বতমালা হিমালয় অবস্থিত হওয়ায় এবং দেশের প্রধান প্রধান নদীগুলির উৎপত্তিস্থল এই পার্বত্য অঞ্চলে হওয়ায় নদীগুলি প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে। হাইড্রোলজিস্টদের হিসাবমতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র প্রতি বছর যথাক্রমে ৫০ এবং ৯০ কোটি টন পলি বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে বহন করিয়া আনে। এই বিপুল পরিমাণ পলি মোহনায়

নদীখাতে বদ্বীপের সৃষ্টি করার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তিত নদীখাতে আবার বদ্বীপ সৃষ্টির কাজ চলিতে থাকে। এইভাবে নিম্ন-প্রবাহে নদীগুলির গতি পরিবর্তন এবং নূতন বদ্বীপ গঠনের কাজ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকায় অসংখ্য দ্বীপ উপদ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে প্রায় পাঁচ শতাধিক মাইল দীর্ঘ তটরেখা। খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল এবং নোয়াখালী জেলার দক্ষিণভাগ প্রধানতঃ এই বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬০ সালের পরিকল্পিত উপকূলীয় বেড়ী বাঁধ বেষ্টনীর বাহিরে বিগত দশকে ব্যাপক আকারে নূতন চর অথবা বদ্বীপ জাগিয়া উঠিতেছে। এই নূতন জাগিয়া উঠা ভূমির ব্যাপকতা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনার বিজ্ঞান ভিত্তিক সমর্থন পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের শেষ দিকে ই আর টি এস পাঠানো প্রতিচ্ছবিতে। ইহার ফলে একদিকে যেমন জল্পনা কল্পনার অবসান হয় অন্যদিকে এই সমস্ত নূতন ভূ-ভাগের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কাজও সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এই বদ্বীপ অঞ্চল ছাড়াও চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিম পার্শ্বে উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত এক দীর্ঘ তটরেখা রহিয়াছে যাহা গঠন প্রকৃতির দিক দিয়া দেশের অন্যান্য উপকূল ভাগ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

উপকূল অঞ্চলের এই সব দ্বীপের মাটি উর্বর এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ খুবই কম হাওয়ায় অভাব প্রপীড়িত মানুষ জীবিকার সন্ধানে জীবনের ঝুঁকি লইয়াও নব-গঠিত দ্বীপাঞ্চলে চাষবাস করিতে ছুটিয়া যায়। এই সমস্ত জীবিকা সন্ধানী নির্ভীক মানুষেরা শতাব্দীর অবক্ষেপনের ফলে উপকূল অঞ্চলে গড়িয়া তুলিয়াছে বিস্তীর্ণ ঘন বসতিপূর্ণ জনপদ। কিন্তু খেয়ালী প্রকৃতির নির্মম রুদ্ররোষ বারবার তাহাদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে নানা প্রকার দুর্যোগরূপ ধারণ করিয়া বারবার লেহন করিয়াছে তাহাদের কষ্টার্জিত সম্পদ এবং সাগরগর্ভে বিলীন করিয়াছে তাহাদের অতি প্রিয়জনদের সুখময় অস্তিত্ব। প্রকৃতির এই বিপর্যয় এই অঞ্চলের মানুষকে ভীত করে নাই, বরং করিয়াছে দৃঢ় এবং দুর্জেয়। ফলে তাহারা প্রকৃতিরোষকে উপেক্ষা করিয়া নূতন জাগিয়া উঠা ভূ-ভাগের উপরে বসতি স্থাপন করিতে আগাইয়া আসিতে সদা প্রস্তুত।

উপকূল অঞ্চলের দুর্যোগের ইতিহাস

পাঁচশত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মার্চ—এপ্রিল এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাস এমন কোন নূতন ঘটনা নয়। ১৫৬৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বরিশাল জেলায় দুই লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। ১৭৯০ সালে নোয়াখালী জেলার উপকূল ভাগের উপর এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছাস আঘাত হানে। ১৮২২ সালের প্রলয়ংকরী ঝড়ে বরিশাল জেলার ৭০,০০০ এরও বেশী লোক প্রাণ হারায় এবং হাতিয়া দ্বীপের শতকরা নব্বইভাগ অধিবাসী নিশ্চিহ্ন হয়। ১৮৭৬ সালের নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাস বাংলাদেশের সমগ্র উপকূল ভাগের উপর আঘাত হানে। স্যার ওমব্রিগর এর মতে, এই ঝড়ে তিন লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে এবং ১৯৭০ এর ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাস বরিশাল, নোয়াখালী এবং পটুয়াখালী জেলার উপকূল অঞ্চলে স্মরণাতীত কালের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আঘাত হানে ফলে কমপক্ষে লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। দুর্য্যোগের পৌণঃপুনিকতা হইতে ইহা আশংকা করা যাইতে পারে যে আগামী বৎসরগুলিতেও যে কোন সময় দেশের উপকূলভাগের উপর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ছোবল মারিতে পারে। এই আশংকার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে দুর্য্যোগের হাত হইতে উপকূলবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক সরকারী প্রচেষ্টা চলিতেছে।

উপকূলবাসীদের নানাবিধ সমস্যা

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অতীব সমস্যা জর্জরিত। তাহার মধ্যে নিরক্ষরতা, যাতায়াতে

অব্যবস্থা, ভূমির লবণাক্ততা, বেকারত্ব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগই প্রধান। শতকরা ৮৫ জনেরও বেশী লোক নিরক্ষর। শতাব্দীর অবহেলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানকার অধিবাসীদের অর্থনীতিকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। তাই উপকূলবাসীদের বেসরকারী চেষ্টা স্বত্বেও এই অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে নাই। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সীমিত সংখ্যক বিদ্যালয়ই জনশিক্ষার একমাত্র অবলম্বন। অত্যধিক দরিদ্রতার জন্য এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এই অঞ্চলে নিরক্ষরতার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল এবং নোয়াখালী জেলার দক্ষিণাঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। পায়ে হাঁটা পথ এবং স্থানীয় নৌকা ছাড়া যানবাহনের আর কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। অসংখ্য নদীনালা এবং খাল বিলের বেষ্টনীর ফলে হাঁটা পথে অধিক দূরত্ব অতিক্রম করাও দুঃসাধ্য। যদিও জেলা সদরের সঙ্গে থানা সহরগুলির এবং বড় বড় হাট বাজারগুলির দৈনিক মোটরলঞ্চ সংযোগ রহিয়াছে, তথাপি প্রতিকূল আবহাওয়ায় বৎসরের অধিকাংশ সময়েই এই যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। ত্বরিত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার অভাবে এবং অশিক্ষা ও দরিদ্রতাজনিত কারণে দেশে শিল্পায়নের সুফল উপকূলবাসীদের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

সাবেক পদ্ধতিতে চাষবাস, পশু পালন এবং মাছ ধরাই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। ভূমি এবং পানির লবণাক্ততা চাষের সম্প্রসারণকে অনেকাংশে সীমিত করিয়াছে। এ যাবত এই এলাকায় স্থানীয় প্রজাতির কম উৎপাদনশীল ধানের একটি মাত্র ফসল উৎপাদিত হইত। বর্দ্ধিত জনসংখ্যা এবং জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না পারায় এখানকার অর্থনীতি দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। তদুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জানমালের অবক্ষয় ক্ষীণবল ভঙ্গুর অর্থনীতির উপরে মারাত্মক আঘাত হানিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আজ প্রায় সর্বহারার পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে।

দ্বীপাঞ্চলীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ

শতাব্দীর অবহেলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্রের তীব্র পীড়নের ফলে এখানকার অধিবাসীগন নির্ভীক, দুর্জেয় এবং সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সংগ্রাম তাহাদের জীবনের একাংশ রূপে পরিগণিত। এই সংগ্রাম কখনও বা মনুষ্যসৃষ্ট অবিচারের বিরুদ্ধে, কখনও বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে নিজেদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য। সংঘবদ্ধ ভাবে তাহারা মাটির বাঁধ তৈয়ার করিয়া সামুদ্রিক জলোচ্ছাস হইতে নিজেদের কষ্টার্জিত ফসল বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। এই শুভ প্রচেষ্টা কখনও সফল হইয়াছে আবার কখনও বা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের টিকিয়া থাকিবার সংগ্রাম কখনও থামিয়া যায় নাই।

১৯৬০ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা অনুধাবন করিয়া সারা দেশের বিবেক আন্দোলিত হয়। তৎকালীন সরকার বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ২০ কোটিরও অধিক মার্কিন ডলার ব্যয়ে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করে। সরকারী হিসাবমতে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের প্রথম পর্বের প্রায় ২,০০০ মাইল দীর্ঘ বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ইহার ফলে ২০ লক্ষ একর জমির ফসল লবনাক্ততা জনিত ক্ষতি হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয় পর্বের কাজ সমাপ্ত হইলে আরও ৭ লক্ষ একর জমির ফসল রক্ষা পাইবে। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুবিধ ঃ যথা (১) আবাদী জমিকে লবণাক্ততা জনিত ক্ষতি হইতে রক্ষা করা যাহার ফলে একর প্রতি প্রায় সাড়ে সাত মন অধিক ধান উৎপন্ন হইবে, (২) বাঁধকে জনপথ হিসাবে ব্যবহার করার ফলে আভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে, (৩) ঘূর্ণিঝড় এবং জলো ছ্যাস এর সময় অধিবাসীদের

জানমাল নিরাপদ রাখিবে এবং (৪) আংশিক ভাবে বেকারত্ব দূর করিবে। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পরিকল্পনা ত্রুটিমুক্ত না হইলেও এই বাঁধ স্থানীয় জনসাধারণের জান মালের নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অভীব প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করিতেছে। অতএব, উপকূলীয় বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নে সরকার যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন।

উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প

প্রসঙ্গান্তে ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে অন্ততঃ বেশ কয়েক শতাব্দী হইতে খুলনা জেলা দুর্যোগের তাণ্ডব হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। এই অব্যাহতির মূলে খুলনা জেলার উপকূল বেষ্টিত সুন্দর বনের ভূমিকা ঠিক কতটা সেই সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকিলেও এরূপ ধারণা করা সহজ যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সুন্দর বনের ঘন বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বেই অনেকটা স্তিমিত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে দুর্য্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এই অঞ্চলে অনেক কম হইয়া থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া বাংলাদেশের দীর্ঘ উপকূল ব্যাপিয়া বন বেষ্টনী সৃষ্টির ব্যাপারে সরকারী পর্য্যায়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। ১৯৬৫—৬৬ অর্থ বৎসর হইতে বন বিভাগের দায়িত্বে পরীক্ষামূলকভাবে বনায়নের কাজও আরম্ভ হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে আরও ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া ১৯৭০-৭১ অর্থ বছর পর্য্যন্ত প্রায় ১০,০০০ একর জমিতে বনায়ন এর কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রাথমিক পর্য্যায়ে উপকূলীয় বনায়নের এলাকা কেবল মাত্র বাঁধের বাহিরের পরিত্যক্ত চিলতে জমিতে আরম্ভ হইলেও পরবর্তী পর্য্যায়ে নূতন জাগিয়া উঠা চর অঞ্চলকেও বনায়নের আওতায় আনা হয়। বনায়ন কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনার ব্যাপকতা এবং বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্বন্ধেও বন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। বর্তমানে উপকূল অঞ্চলে বনায়ন প্রকল্প বন বিভাগ প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিশেষতঃ ই আর টি এস প্রতিচ্ছবি হইতে নূতন জাগিয়া উঠা ভূমির ব্যাপকতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের পরিপ্রেক্ষিতে এই বনায়ন প্রকল্পের বিপুল সম্ভাবনার দিকে চিন্তাশীল মহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। নূতন সৃষ্ট চরগুলির কর্দমাক্ত পলি মাটির পরিপক্কতা এবং স্থিতিশীল করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহলে চিন্তা ভাবনায় মতভেদেরও অবকাশ রহিয়াছে। এই বিষয়ে কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়াই বলা যাইতে পারে যে আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে ব্যয়বহুল কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়ার কথা এই মুহূর্তে না ভাবিয়া ব্যাপক এলাকায় বন সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যাপক বনায়নের ফলে চর জাগিয়া উঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হইবে এবং নূতন চরের মাটিও প্রাকৃতিক উপায়ে স্থিতিশীল হইবে। বাংলাদেশে সরকারের পরিকল্পনা বিভাগ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং প্রথম পাঁচ সালা পরিকল্পনা কার্য্যক্রমে প্রায় ২০,০০০ একর জমিতে নূতন বন সৃষ্টির এবং তৎসঙ্গে ৪৭,০০০ একর জমির সীমানা নির্ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম তিন বৎসরেই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করিয়া প্রায় ৩১,৭০০ একর জমিতে বনায়নের কাজ সম্পন্ন হয়। এই বাবদে বরাদ্দকৃত তিন কোটি পাঁচ লক্ষ টাকাও এরই মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় মাননীয় রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বৎসর ১৬,০০০ একর জমিতে বনায়নের জন্য এক বৃহত্তর পরিকল্পনা হাতে লওয়া হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইলে আগামী পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে উপকূল অঞ্চলে সৃষ্ট নূতন বনভূমির মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ১,১২,০০০ একর। নূতন সৃষ্ট বনভূমির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হইলে প্রাকৃতিক উপায়েই গাছের বংশ বৃদ্ধি হইবে এবং নূতন জাগিয়া উঠা এলাকায় ভবিষ্যতে

বনায়নের কাজ চালাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

উপকূলীয় বনায়নের উপযোগী বৃক্ষপ্রজাতি নির্ধারণ

বনায়ন কাজের জন্য মাটি, পানি এবং পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দ্রুত বর্দ্ধনশীল বৃক্ষ প্রজাতির নির্ধারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে বনজাত দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা এবং দেশের ভবিষ্যত শিল্পায়নের চাহিদার প্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মাটি, পানি এবং পরিবেশ জনিত কারণ বিবেচনা করিয়া বাঁধের উপরিভাগ এবং অভ্যন্তর ভাগে খেজুর, বাবলা প্রভৃতি কাঁটাযুক্ত প্রজাতির গাছের চাষ করা দরকার। এই জাতীয় গাছ একদিকে যেমন বাঁধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির সহায়ক অপরদিকে কাঁটাযুক্ত হওয়ায় গবাদি পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায়ও সক্ষম। বাঁধের বাহিরে পতিত জমি এবং চরগুলি লোনা পানি বিধৌত হওয়ায় এই জমিতে কেওড়া, বাইন, গেওয়া, কাঁকড়া, পশুর এবং গোলপাতা জাতীয় গাছ লাগান যাইতে পারে। এই সমস্ত গাছের বীজ সুন্দরবন হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

উপকূলীয় বনায়নের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

উপকূলীয় বনায়ন পরিকল্পনার বহুবিধ সম্ভাবনাময় দিক রহিয়াছে। এই প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রকার জবর দখল ছাড়াই এক ব্যাপক এলাকায় বনসৃষ্টি সম্ভব। ব্যাপক বনায়নের ফলে চর জাগিয়া উঠার প্রক্রিয়া এবং নূতন জাগা চরে কর্দমাক্ত পলির পরিপক্কতা ত্বরান্বিত হইবে। সরকারী মালিকানার খাস জমি বে-আইনী দখলকারী হইতেও রক্ষা পাইবে। উপকূলীয় বাঁধে বন বেষ্টনী সৃষ্টির ফলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সরাসরি আঘাত হইতে বাঁধকে রক্ষা করিয়া জনগনের জান মালের নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক হইবে। ইহা ছাড়াও সম্প্রসারিত বনাঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক দিক রহিয়াছে। বন বিভাগের দেওয়া এক প্রাথমিক হিসাব মতে দেখা যায় যে বাঁধের উপরিভাগে খেজুর গাছের চাষ বাস্তবায়নের দ্বারাই বর্তমান বাজার দরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার গুড় এবং অন্যান্য উপজাত পণ্যের উৎপাদন সম্ভব হইবে। সুন্দরবনের অর্থনৈতিক উপাত্তের উপরে নির্ভর করিয়া এইকথা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হইলে বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ আহরণ কাজে আগামী ২।৩ দশকের মধ্যে এতদ্‌অঞ্চলের প্রায় লক্ষাধিক লোকের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তদুপরি বনজ কাঁচামাল-নির্ভর শিল্প সংস্থাগুলিতেও বিপুল সংখ্যক লোকের কর্ম সংস্থান হইবে। এই সমস্ত বনজ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির স্থানীয় চাহিদার উদ্‌বৃত্তাংশ রপ্তানীরও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব, দেখা যায় যে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প এবং উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ অনেকটা সুদৃঢ় করিতে সহায়তা করিবে।

বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সরকারী মালিকানার জমি স্থানীয় লোকদের বারোয়ারী চারণভূমি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে এইসব জমিতে বনায়নের কাজ আরম্ভ হইলে গো-চারণভূমি নিঃশেষ হইবে। তাই সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টাকে স্থানীয় লোকেরা সহজভাবে গ্রহণ না করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের এক বড় বাধা স্বরূপ মনে করিবে এবং সুযোগ পাইলে তাহাদের গৃহপালিত পশুগুলি ছাড়িয়া দিয়া চারা গাছের ক্ষতি সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। এইভাবে স্থানীয় লোকের অসহযোগিতার ফলে কোন কোন স্থানে বনায়ন কাজে বাধার সৃষ্টি হইলেও কালক্রমে লোকেরা ইহার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিলে ভবিষ্যতে বনায়নে আর কোন বাধা থাকিবে না।

এইক্ষেত্রে বন বিভাগীয় কর্মকর্তাগনের দায়িত্ব হইবে একান্ত ধৈর্য্য এবং প্রচেষ্টার দ্বারা বন বেষ্টনীর উপকারিতা সম্বন্ধে লোকদের সুশিক্ষিত করা।

স্থানীয় জনগনকে বনায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত করিতে পারিলে বন বেষ্টনী রক্ষার কাজে নিজেরাই তৎপর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। উপকূলীয় বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ইতিমধ্যেই স্থানীয় লোকদের অনেকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

উপসংহার

উচ্চাভিলাসী প্রকল্প প্রণয়নের কাজ ইহার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দায়িত্বের তুলনায় অনেক সহজতর। উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দেশের অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করার কাজে নিজ নিজ অবদান রাখিবার এক বিরাট সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। একমাত্র ভবিষ্যত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই প্রতীয়মান হইবে যে এই গুরু দায়িত্ব পালনে তাঁহারা কতটা সততা, নিষ্ঠা এবং দক্ষ প্রযুক্তি জ্ঞানের স্বাক্ষর রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার একান্ত বিশ্বাস, সততা এবং নিষ্ঠার সহিত কাজ করিলে এই মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দুঃসাধ্য হইবে না।

এই বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হইলে বাংলাদেশের দীর্ঘ বেলাভূমি যেখানে আজ সহস্র উর্ম্মির গর্জন বিরাজমান, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সেখানেই সৃষ্টি হইবে এক স্বপ্নিল সবুজ বনরাণী--এক এলায়িত রূপসী বনবেষ্টনী।এই বনরাণীর অনুগ্রহেই হয়তো সেই দিন দ্বীপাঞ্চলবাসীগন লাভ করিবে বৈচিত্র্য, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি। জীবন তাহাদের কাছে তখন আরও অর্থবহ হইয়া উঠিবে।